জগদীশ গুপ্তের গল্প : নারী-মনোলোকের বিচিত্র রূপ

সুলতানা নাজনীন*

[সারসংক্ষেপ : সরল নয় বরং জটিলতাই মানব-মনের অন্যতম ধর্ম। সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষের এই মনোজটিলতার স্বরূপ উন্মোচন ও চিত্রণ করেন সাহিত্যিকগণ। বাংলা ছোটগল্পে মনোবাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে জগদীশ গুপ্তর (১৮৮৬-১৯৫৭) ভূমিকা অনন্য। তিনি মানব-মনের জটিলতাকে অভ্যস্ত ও পরিচিত ধারণা থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে সমাকৃত করেছেন। অবচেতনের গভীরে মানসিক জটিলতার ফলে তাঁর চরিত্ররা কখনো জীবনবিচ্ছিন্নতা আবার কখনো বা শূন্যতাবোধে আক্রান্ত। নারী-মনস্তত্ত্বের প্রতি যে বিশেষ আগ্রহ তাঁর প্রমাণ বাংলা ছোটগল্পে রয়েছে। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা নারীর মনোজটিলতার রহস্য যেমন উন্মোচিত হয়েছে, অনুরূপভাবে পরিচিত ও চিরায়ত নারী-রূপের পরিচয়ও রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখকের আগ্রহের স্বরূপ 'নারীর মনের বহুমাত্রিকতা' অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হবে।]

ভূমিকা

"জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিলো তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত" (সরোজ, ১৯৭১ : ১৬৪)। কল্লোল-গোষ্ঠীর রোমান্টিক ভাবালু জীবনদৃষ্টি থেকে বাংলা-গল্পকে জগদীশ গুপ্ত স্থানান্তরিত করেছিলেন এক রুক্ষ, নির্মোহ, অন্ধনিয়তি-তাড়িত হতাশাময় জনহীন দেশে; যেখানে আর্তমানুষ অসহায়, নিরুপায় হয়ে হাহাকার করে ভেঙে পড়ে। তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবনকে অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানব-চরিত্রের অন্তর্গত জটিলতা এবং মানবজীবনের গহনসঞ্চারী রহস্যর উৎস-সন্ধানই ছিল তাঁর শিল্পী সত্তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। তাঁর গল্প একদিকে জীবন রহস্যের অতল অন্ধকারের দিকে সঙ্কেত দেয়, অন্যদিকে সমাজ ও ব্যক্তির অসঙ্গতির রন্ধ্রপথের দিকেই ইঙ্গিত করে। বিশ্বজিৎ ঘোষ জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে বলেন :

> জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পৌনঃপুনিকভাবে নিয়তিশাসিত অসহায় একাকী মানুষের ছবি এঁকেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে শিল্পিত হয়েছে বিপর্যস্ত মানবাত্মার বিনষ্টি, মানুষের ক্লিন্ন-বিকার এবং অন্তশ্চাপ-বহিশ্চাপসম্ভব বহুমাত্রিক অসঙ্গতি। সমাজ-অসঙ্গতিজাত ব্যক্তি অসঙ্গতির রন্ধ্রপথেই জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যে ছায়াপাত ঘটেছে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার। (বিশ্বজিৎ, ২০১৬ : ৮৬)

মানব-চরিত্র উপলব্ধি ও জীবনার্থ সন্ধানের ঐকান্তিক প্রয়াস-সূত্রে জীবনের যে সর্পিলরূপ ও তির্যক গতি তা এই লেখকের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃত্ত হয়েছে। "তার ফলে জীবন সম্পর্কে এক প্রবল সংশয় ও অবিশ্বাসে তাঁর মন তিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে" (গোপিকানাথ, ২০১০ : ২৪৩)। আর তাঁর গল্পের বিশ্লেষণে বলা চলে : "জগদীশ গুপ্তের গল্পালোকে মানুষ নীচ, প্রকৃতি

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

নিষ্ঠুর, নিয়তিও কুচক্রী" (অরুণকুমার, ১৯৯৫ : ৩৩৬)। মূলত বোধ ও প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয় মানবজীবন। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই জগদীশ গুপ্ত জীবনের সকল প্রতিক্রিয়ার সূত্র ব্যক্তিমানস চেতনার গভীরে সন্ধান করেছেন। ব্যক্তিমানসকে কীভাবে পরিবর্তিত করে সমাজ ও ইতিহাসের গতি – এ দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই সমাজ এবং ব্যক্তিকে তিনি দেখেননি। চরিত্রের সম্পর্ক এবং সংঘাত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে চরিত্ররাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ সম্পর্কে স্মর্তব্য সমরেশ মজুমদারের ভাষ্য :

> চরিত্রেরাই জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে প্রাধান্য পায়, কাহিনী নয়, কাহিনীর কারণে চরিত্রেরা আসে না, চরিত্রের গঠনের জন্য কাহিনী বা কাহিনীসমূহ। আবার চরিত্রেরা নিয়তিতাড়িত, দুর্জ্ঞেয় রহস্যের শিকার মাত্র, নগ্নতা কেবল বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, নগ্ন হয়ে ধরা দেয় এক নির্মোহ ক্রূরতা, সেখানে লেখক নির্বিকার লেখকের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার চরিত্রসমূহ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে নিয়তি নির্ধারিত হয়েছিল, সেই ছক ভেঙেছেন জগদীশ গুপ্ত। (সমরেশ, ২০১২ : ১৯৮-১৯৯)

জগদীশ গুপ্ত নর-নারীর মনোজীবনের নিগূঢ় রহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে চেয়েছেন। কারণ, মানুষের শুভ পরিণতিতে লেখকের আস্থা নেই। তাঁর ছোটগল্পে বিনষ্ট ভাগ্যহীন মানুষের বেদনা, অসহায়তা, হতাশা, ব্যর্থতা প্রাধান্য পেয়েছে – যেখানে নিয়তি অলঙ্ঘ্য, ক্ষমাহীন, নির্মম ও নিষ্ঠুর। জগদীশ গুপ্তর কাছে নিয়তি নামক এই শক্তি অমোঘ ও ভয়ংকর ফলে জীবনের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

জগদীশ গুপ্তের গল্পে উপস্থিত চরিত্রগুলি প্রাথমিকভাবে বাঙালি পরিবেশের অভ্যস্থ গার্হস্থ্য জীবনের চরিত্রানুযায়ী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কাহিনি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলির প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলে চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশিত ধারণাকে বিপর্যস্ত করে নতুন সম্পর্কের প্রতি দিক নির্দেশ করে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রকটিত হলেও সেখানে দেহাশ্রিত বিষয় প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে নারী-চরিত্র চিত্রণে তাদের অবদমিত কামনা-বাসনার স্বরূপ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অশ্রুকুমার সিকদার বলেন :

> শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার প্রভৃতির সম্মিলিত প্রয়াসে কথাসাহিত্যে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে জগদীশ গুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিবাদ। বাঙলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার বিবেচনা জগদীশ গুপ্তকে দিয়ে শুরু করতে হয়। (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮ : ৫০৭)

জগদীশ গুপ্তের গল্পের চরিত্ররা গ্রামের নিচুতলার মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব। বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা, নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত মনোভঙ্গির সমন্বয়ে নারী-মনস্তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করেন গল্পকার। নারী-জীবনের চিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাই নারীর সামাজিক ও পারিবারিক সত্তার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে তার ব্যক্তি-সত্তা। নারী-চরিত্রের সামাজিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সত্তার দিকে মনোযোগ ছিল বলেই গল্পে তিনি নারীকে পূর্ণাঙ্গ সত্তাসহ বিশ্লেষণে সাফল্য দেখিয়েছেন।

জগদীশ গুপ্ত নানাভাবে তাঁর গল্পের নারী-চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি নারীদের মাতৃত্ব, অসহায়ত্ব, অলৌকিক ক্ষমতার উৎস, প্রেয়সী আবার কখনো ভোগের সামগ্রী হিসেবে

দেখিয়েছেন। যেখানে কোনো কোনো নারী আবিষ্কার করেছে নিজের মনুষ্যত্ব ও অস্তিত্ব। যে কারণে তারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেউ হয়েছে সমাজে কলঙ্কিত, কেউ হয়েছে বাড়ি হতে বিতাড়িত আবার কখনো কেউ হয়েছে সম্পূর্ণ উন্মাদ। তবে তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে নারী কোনো না কোনো রূপে উপস্থিত হয়েছে। কখনো কোনো গল্পের কাহিনি বা ঘটনা নারীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে; কোনো কোনো গল্পের কাহিনিকে নারীচরিত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে। তিনি স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক বলে তাঁর ছোটগল্পের নারীরাও চরিত্রের দিক থেকে স্বতন্ত্র আর তিনি সেভাবেই উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পের নারীচরিত্রকে।

> জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির সংখ্যা ও বিশিষ্টতা বহুতর, আচারে ব্যবহারে বৈচিত্র্যও তাদের যথেষ্ট, বহুক্ষেত্রে তাদের কামনা বাসনা স্পষ্ট ও নগ্ন। পেটের ক্ষুধা ও দেহের বাসনা গোপন করবার চিৎপ্রকর্ষপূর্ণ কৌশলটি তাদের অজ্ঞাত। (সমরেশ, ২০১২ : ২০৩)

বর্তমান নিবন্ধে আমরা জগদীশ গুপ্তের গল্পের আলোকে তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

এক. নারীর চিরায়ত মাতৃরূপ

নারীর জীবনে যেকোনো কিছুর চেয়ে মাতৃত্বের মহিমা সবচেয়ে বড়। সন্তান বাৎসল্য ও সহমর্মিতার এক অসামান্য সৃষ্টি 'দিবসের শেষে'র পাঁচুর মা নারানী। একদিকে অপত্যস্নেহ অন্যদিকে সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিয়ে সে হয়েছে বিচলিত ও শঙ্কিত। এ গল্পে গল্পকার রতি ও নারানীর দাম্পত্য-জীবনে তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহে বিসর্জন দিয়ে চতুর্থ ও একমাত্র পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচুর জীবনে ঘটে যাওয়া নিয়তির অমোঘ পরিণামের সাথে সাথে মায়ের মনের-শঙ্কা ও ভয় ফুটিয়ে তুলেছেন। পাঁচু সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকে যখন জানিয়েছিল যে, আজ তাকে কুমিরে নেবে, তখন নারানী প্রথমে কথাটা উড়িয়ে দিলেও সারাদিন তার মনে বাসা বেঁধে ছিল আশঙ্কা ও ভয়। তাই পাঁচু গোসল করতে না চাওয়ায় নারানীও স্বামীকে বলছিল : "নাইতে চাইছে না, থাক না আজ।" (জগদীশ, ২০১৫ : ৫৯)

সন্তানের জন্য অগাধ ও অপরিমিত ভালোবাসাই নারানীর মনে এরূপ দোলাচল বা সংকটের সৃষ্টি করেছে। দিন শেষে অমোঘ ভাগ্যের খেলায় নিয়তি নামক কুমির যখন পাঁচুকে নিয়ে যায় তখন শেষ বারের মতো যখন পাঁচুকে সবাই দেখছিল তখন তার মায়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন লেখক এভাবে : "কেবল পাঁচুরমা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা" (জগদীশ, ২০০৫ : ৬২)। পুত্রকে নিয়ে মায়ের মনের শঙ্কা ও ত্রাস শেষ পর্যন্ত ধরা দেয় নিয়তির কাছে। পুত্রের এই করুণ পরিণতিতে মায়ের শোক ও শোচনীয় অবস্থা এ গল্পে লক্ষযোগ্য।

"বাংলা সাহিত্যের জনকরা নরাধম, কিন্তু জননীরা মহিয়সী, অবশ্য জননীদের এই সচ্চরিত্রের পশ্চাতে রয়েছে ম্যাক্সিম গোর্কির অমর উপন্যাস মা'র প্রেরণা" (রশীদ, ১৯৯০ : ০৬)। এরকম নরাধম জনক ও মহিয়সী মাতৃরূপ ফুটে উঠেছে জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম্' গল্পে। যেখানে সম্পূর্ণ বিষয়ী, ধূর্তরূপে পিতা কৃষ্ণকান্ত সেখানে তার বিপরীতে মাতঙ্গিনী সহজ সরল বাঙালি বধূ ও মা হিসেবে উপস্থিত। মাতঙ্গিনী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বীরেন্দ্র দত্ত বলেন :

> পুত্রস্নেহ তার অলংকার এবং সেই সূত্রে পুত্রবধূদের জন্য তার যাবতীয় ভাব-ভাবনা, ভয়-সংশয়, অস্থিরতা-চাঞ্চল্য তার অন্তর্নিহিত সারল্যের সঙ্গেই সংমিশ্রিত থেকেছে, নিজের সুখ-দুঃখকে একান্ত কাম্য মনে করেনি। তার বধূজীবন ও মাতৃজীবন সেই স্বামী-পুত্রধন্য সংসারের জন্যই যেন নিবেদিত। (বীরেন্দ্র, ১৯৮৫ : ২৬৩)

এ গল্পে মাতঙ্গিনীর স্বামী কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা পুত্র ভূতনাথের বিবাহে পণের টাকা লাভ করার জন্য ঔষধের পরিবর্তে বিষ প্রয়োগ করে পুত্রবধূদের হত্যা করে। ফলে এ গল্পে অর্থলিপ্সা, নিষ্ঠুর মানবিকতার পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসা। কৃষ্ণকান্তের নিষ্ঠুর অর্থলিপ্সার জন্য পুত্রবধূরা যখন বলি হতে থাকে তখন তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে মাতঙ্গিনীর মাতৃহৃদয়ে শুরু হয় হাহাকার। প্রথম পুত্রবধূ ন-বছরের মণিমালিকা যাকে শাসনে আবদারে পুত্রবধূর থেকে কন্যার মতো সামলায় তাকে হারানোর পর মাতঙ্গিনীকে স্মৃতি যেমন র্জজরিত করে তেমনি পুত্র-বধূর কষ্টে বুক ফেটে যায়। লেখক এ অবস্থায় মাতঙ্গিনীকে তুলে ধরেন এভাবে :

> 'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মতো অনুক্ষণ সে পায়-পায় ঘুরিতো। সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন! মণির মুখখানি বিষন্ন হইয়া উঠিতো [...] এই ম্লান, এই উজ্জ্বল [...] পরক্ষণেই সে 'মা' বলিয়া ঘেঁষিয়া আসিতো। মাতঙ্গিনীর বুক ফাট ফাট করে। (জগদীশ, ২০১৫ : ৬৬)

প্রথমা পুত্রবধূর মৃত্যুর পর মাতঙ্গিনী যখন শোকাকুল, তখনই দ্বিতীয়া পুত্রবধূ অনুপমা এসেছে। অনুপমার দুরন্ত স্বভাবকে তার পুত্রের প্রতি শান্ত করার অভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী ঊর্ধ্বের দয়া-ভিক্ষায় নিমগ্ন হয়। অনুপমার রূপ-সৌন্দর্য দেখে শান্তি পান মাতঙ্গিনী : "যেন তাঁর চতুর্দিকেই খর রৌদ্র [...] তার ঝাঁজে চক্ষু পীড়িত হইয়া উঠে [...] তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারংবার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান" (জগদীশ, ২০১৫ : ৬৭)। অনুপমার মৃত্যুর পর তৃতীয় বধূ বীণাপাণিকে সভয়ে চির-আয়ুষ্মতী হওয়ার আশীর্বাদ করেন। পুত্রের কথা ভেবে, অতীত সকরুণ ঘটনাগুলির আশঙ্কায় মাতঙ্গিনীর মন অস্থির হয়ে ওঠে। আগের দুই পুত্রবধূর মতো বীণাপাণির জ্বর এলে মাতঙ্গিনীর বিচলিত মানসিক অবস্থা লেখক তুলে ধরেন এভাবে :

> বীণাপাণির জ্বর।
>
> জ্বর অল্প। কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বালিয়া উঠিয়াছে। [...] আকুলি-বিকুলি কেবলই মধুসূধনকে ডাকিয়া-ডাকিয়া উৎকণ্ঠায়-উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে। (জগদীশ, ২০১৫ : ৭৬)

পুত্রবধূদের আপন মেয়ের মতো দেখেন বলে মাতঙ্গিনীর মাতৃহৃদয়ে তাদের প্রতি স্নেহ পরিপূর্ণ। তাই তাদের জন্যে তার মনে এত শঙ্কা ও ভয়। কেননা সে একটি নয় দুটি পুত্রবধূ হারিয়েছে। বীণাপাণির অল্প জ্বর হলেও তার ভয় আরো বেশি প্রকট হয়েছে, কারণ আগের দুই পুত্রবধূর মতো এবারও যে পুত্রবধূ মৃত্যুবরণ করবে না তার ভরসা সে পাচ্ছে না। বীণাপাণির মধ্যে পূর্ববর্তী পুত্রবধূদের পরিণতি যেন দেখতে পাচ্ছে। তাই মাতঙ্গিনীর অন্তরাত্মায় পৃথিবীর সমস্ত দুশ্চিন্তা দাবানলের দাহ হয়ে জ্বলে উঠতে চাইছে যেন। নারানী ও মাতঙ্গিনীর স্নেহময়ী মাতৃরূপ সম্পর্কে সুজিৎ ঘোষ বলেন :

> নারীপুরুষের সম্পর্কের যে ফল, সমাজের আশ্রয় হিসেবে মাতৃত্বের ধারণাটি জগদীশে অতুলনীয়ভাবে উজ্জ্বল – 'দিবসের শেষে'র পাঁচুর মায়ের মধ্যে সেই মাতৃত্বের প্রকাশ, যা আরও উজ্জ্বলবর্ণে 'পয়োমুখম্' গল্পে মাতঙ্গিনী চরিত্রে দেখা যাবে, শাশুড়ী হয়েও পুত্রবধূদের জন্যে তাঁর মমতা ও আশঙ্কার শেষ নেই। (সুজিৎ, ২০১২ : ১৪৭)

'হাড়' চরিত্রাত্মক গল্প। এ গল্পে চিত্তস্বাতন্ত্র্যে নারীর মাতৃত্বভাবনার মনস্তত্ত্বে ভিন্ন মাত্রা পায় রসি চরিত্রটি। স্বামী সনাতনের চুরি করা, জেল খাটা, কটু-কর্কশ, দাম্ভিক, বদরাগী স্বভাবের কারণে স্ত্রী রক্ষা ক্ষয়রোগে মারা যায়। রক্ষা মারা যাওয়ার পূর্বে তার ছয় বছরের ছেলে মথুরকে রসির কাছে রেখে বড় করার অনুরোধ করে। কিন্তু রক্ষার মৃত্যুর পর রসি মথুরকে নিয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করলে সনাতন কুৎসিত গালাগাল করে রসিকে। সনাতনের অপমানে রসি কাঁদেনি, নীরব থেকেছে কিন্তু ভিতরে রাগে জ্বলেছে। কেননা রসির মাতৃ-হৃদয় তীব্র অপমানবোধ ও আত্মসম্মানবোধে পূর্ণ। রসি নারী হিসেবে যেমন মানবিক অনুরূপভাবে রক্ষার অনুরোধ পালন করতে মাতৃত্বের দায়ই মৌল উপজীব্য। তার একদিকে মানুষের প্রতি, অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ অন্যদিকে মথুরের প্রতি মাতৃহৃদয়ের আকুলতা প্রকাশিত। লেখকের বর্ণনায় রসির ভিতরে মাতৃহৃদয়ের গোপন মাতৃত্বের বাসনা ফুটে ওঠে :

> রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো। [...] ইহজন্মে রসিকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই [...] কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই [...] তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত – তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে – এ যে বড়ো লোভের জিনিশ [...]। (জগদীশ, ২০১৫ : ১৪২)

"রসির এই মাতৃভাব বিশুদ্ধ, মানবিক, জীবন্ত, সুস্থ এক নারীর উপযুক্ত ভাবের প্রতীক প্রতীম চিত্রাভাস" (বীরেন্দ্র, ১৯৮৫ : ২৮৮)। রসি এক মাতৃরূপিণী নারী, যে সন্তান পিপাসায় বুভুক্ষু।

এছাড়া 'চন্দ্রসূর্য যতোদিন' গল্পের শাশুড়ির মাতৃরূপ যেমন সমবেদনায় সোচ্চার অনুরূপভাবে তার বড় পুত্রবধূ ক্ষণপ্রভা মাতৃত্বের অনন্য প্রতীকস্বরূপ "সম্পূর্ণ উন্মাদ : কিন্তু ছেলেটি বুকেই আছে" (জগদীশ, ২০১৫ : ৯৯)। 'তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে' গল্পে জগদীশের মাতৃবন্দনার আদর্শটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে : "যে মা হইয়াছে, তাহার পরিচয় কেবল মা – স্ত্রীর দেহ তখন স্বর্গ আর মর্তের তুলনায় মর্তের মতো, নিম্নতর স্তরের জিনিষ, স্বামীর সঙ্গচিন্তা তখন কেন্দ্রচ্যুত, পতনশীল" (জগদীশ, ২০১৫ : ১১৫)। 'আদি কথার একটি' গল্পে কাঞ্চনের সচেতন মন ও প্রবৃত্তি তার মাতৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ গল্পে নারী-পুরুষের মৌল সম্পর্ক, সামাজিক মূল্যবোধ ও মাতৃত্বের টানাপোড়েন প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থিতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

দুই. প্রেমময়ী নারী

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় জগদীশ গুপ্তের ব্যতিক্রমী এবং অভিনব প্রেমের গল্প 'অরূপের রাস', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'রসাভাস' গল্পত্রয়। 'রসাভাস' গল্পে নারী হিসেবে সূর্যমুখীর অবৈধ প্রণয়ে সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কার মনে শক্ত আসন গেড়েছে। সূর্যমুখী স্বামী মুকুন্দের সাথে

বিবাহ বিচ্ছেদের মতো অচ্ছেদ্য ছেদনের সুকঠিন কাজটা খুব সহজে আর সংক্ষেপে ছিন্ন করে চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক বিত্তশালী শ্রীগৌরগোপালের প্রতি অনুগামী হয়। গৌরগোপালের দিকে ধাবিত হলেও হৃদয়নাথের প্রতি তার প্রদর্শিত ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। হৃদয়নাথ যখন সূর্যমুখীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল 'আমি পাগল হয়ে যাবো'; জবাবে সূর্যমুখীও বলল : 'আমিও' (জগদীশ, ২০১৫ : ১৯৯) সূর্যমুখীকে নিয়ে গড়ে ওঠে হৃদয়নাথের কল্পিত ভালোবাসার জগৎ লেখকের বর্ণনায় :

> নিভৃতে তাহারা এই অব্যাহত পরম নিভৃতিই করিবে দিশেহারা স্পর্শকে নিবিড়তম; মিলনকে পূর্ণতম, আলিঙ্গনকে নিঃসন্দিগ্ধ আন্তরিকতায় উষ্ণতম – তাহাদের কণ্ঠকে করিবে অনুচ্চারিত শব্দে মুখর, শব্দকে করিবে অনির্ণেয় অর্থে পূর্ণ, অর্থকে করিবে অচিন্তনীয় রসে এমনি মধুর যে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিহরণ প্রবাহিত হইয়া একসময় মূর্ছার মতো একটা প্রকম্পিত অসাড়তার মাঝে তাহারা বিলীন হইয়া যাবে [...]। (জগদীশ, ২০১৫ : ২০১)

এ গল্পে অশুচি মানুষের স্বরূপে উপস্থিত সূর্যমুখী। হৃদয়নাথের হৃদয়ে যে সূর্যমুখী প্রেয়সী ও প্রেমময়ী হিসেবে চিহ্নিত ও পরিগণিত সেই হৃদয়নাথ সূর্যমুখীর প্রকৃত পরিচয়ে বিস্মিত ও অভিভূত হয়। নীরবাসিনীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে সূর্যমুখীর কথা হৃদয়নাথকে নিরাশ করে :

> ঠিক সেই মুহূর্তেই সুন্দরী সূর্যমুখী তাহাকে একেবারে নিরাশ করিয়া দিয়া অন্ধ রাগের মাথায় পরম শত্রু নীরবাসিনীকে তাহারই দিকে লেলাইয়া দিলো – চম্পক আঙ্গুলি তুলিয়া বলিল – ঐ যে বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা না নিয়ে ঘরে, আট ঘণ্টা ভরতি হোক – হৃদনাথের নিভৃতি বিলাস ইটের ধারে কাচের মতো চূর্ণ হইয়া গেলো। (জগদীশ, ২০১৫ : ২০৩)

সূর্যমুখী চরিত্রটি যদিও কারোও কাছে প্রেয়সী রূপে গণ্য, কিন্তু সর্বোপরি সে ব্যভিচারী, নীতিবর্জিত ও দেহসর্বস্ব। হাসান আজিজুল হক বলেন :

> আমরা মানুষের বাৎসল্য, নিরূপদ্রব সংসার যাত্রা, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদিকে মানুষের রিরংসা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, লালসা ইত্যাদি বৃত্তি থেকে একটু উপরের আসনে বসাতে অভ্যস্ত। মানুষের প্রবৃত্তি জগতের হিসেব নিলে বাৎসল্য যেমন সত্য নিষ্ঠুরতাও তেমনি সত্য। নিষ্ঠুরতার চেয়ে বাৎসল্য মহত্তর বৃত্তি কেন একজন নৈয়ায়িকের কাছে তার কোন যুক্তি নেই। (হাসান, ২০১২ : ২০৬)

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' গল্পে বন্ধুর পত্নী ইন্দিরাকে মুহূর্তের জন্য দূর থেকে দেখে সতীশের মনে রহস্যাবরণে ঘেরা এক কল্পনার জগৎ তৈরি হয়। শশাঙ্কের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসে সতীশ অবরোধবাসিনী ইন্দিরার অনাবৃত মুখ দেখে ফেলে। একদিনের এই চকিত দর্শনে কাব্যবিদ সতীশ ইন্দিরাকে স্বপ্নের নারী ভেবে কল্পনায় ভাসে এবং তাকে মানসসুন্দরীরূপে ভেবে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত হয়। সতীশের মানসিকতায় নারী সম্পর্কিত ফ্যান্টাসি জন্ম নেয়ায় সে বন্ধু পত্নীকে কামনা করে। ইন্দিরাকে নিয়ে সতীশের প্রেমময়ী কল্পনার জগতের বর্ণনা দেন লেখক :

> তার মনে হইতে লাগিলো, এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যারচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে [...] এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে [...] বিরহী যক্ষের প্রিয়া এ, কবির কাব্যলক্ষ্মী মানসী এ; পুরুষের বেদনা ইহারই উদ্দেশে

> চিরদিন নিবেদিত হইতেছে [...] মিলনে বিরহে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া জগৎ প্রাণ নিয়ত নৃত্য করিতেছে [...]। (জগদীশ, ২০১৫ : ৮২-৮৩)

বন্ধু শশাঙ্কের স্ত্রীর মধ্যে সতীশ আদর্শ নারীরূপের সন্ধান লাভ করে কল্পনায় কাব্যলোক ও মানসীরূপ সৃষ্টি করে কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবরে মোহভঙ্গ হয়। কেননা সতীশের কাছে একজন নারী কাব্যরচনার প্রেরণাদাত্রী হতে পারে, হতে পারে স্বপ্নবিলাসী প্রিয়া কিন্তু একজন নারী যখন সন্তানধারণ করে তখন আর সে প্রিয়া বা কাব্যপ্রেয়সী হতে পারে না। "সতীশের আবহমান কালের মানসীর সঙ্গে যে নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল তাহা খাঁড়ার ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলো।" (জগদীশ, ২০১৫ : ৮৫)

'অরূপের রাস' এক জটিলতম ব্যতিক্রমী প্রেম-ভালোবাসার গল্প। জটিল-মনস্তত্ত্বের সাথে সাথে প্রেম সম্পর্কের সঙ্গে একাত্ম পুরুষ-নারীর যৌথ দেহ ভাবনার কথা স্থান পেয়েছে গল্পটিতে। এ গল্পে অন্যতম প্রধান চরিত্র রাণু যে তার বাসনায় এক জটিলতম নারী। ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রাণুর কানুর প্রতি ভালোলাগা থাকলেও কানু রাণুর প্রতি আকর্ষণবোধ করেনি। বহুদিন পর সন্তানবতী বিবাহিত রাণু কানুর মনে অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়ের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপে ধরা দেয় এবং নিজেকে অসম্পূর্ণ অনুভব করে। কিন্তু বিবাহের পর অজ্ঞাত অভিমানে কানুকে এড়িয়ে চলা রাণু দৃপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠে শোনায় : "তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও।" এভাবেই রাণু হয়ে ওঠে তুলনারহিত। রাণু প্রকাশ্যে কানুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও অন্যদিকে সে ক্রমশ হয়ে ওঠে প্রেম পিপাসার্ত। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী হলেও ভিতরে সে প্রেমিককে মুছে ফেলতে পারছে না। "বিশুদ্ধ প্রেমসৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা মজ্জাগত, প্রেমিকের সান্নিধ্যের রক্তাস্বাদে, লালসায় নিঃসঙ্গ লোলুপ। রাণু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাই গল্পকারের নায়িকা রাণু সমকামিতায় কানুর স্ত্রী ইন্দিরাকে অবাধ সখিত্বে কাছে টানে" (বীরেন্দ্র, ১৯৮৫ : ২৯৮)। ইন্দিরার দেহে কানুর স্পর্শ রয়েছে তাই রাণুর উদ্দেশ্য ইন্দিরার গভীরতম সান্নিধ্যের মধ্য থেকে তার প্রেমিক কানুর ত্বক, রক্তের উল্লাসকে নিজের মনে, আত্মায় ও শরীরে অনুভব ও আত্মস্থ করে প্রেমিকের স্পর্শ ও আকর্ষণকে মনের গভীরে চিরন্তন করে রাখা। কানুও বিষয়টি অনুধাবন করে তৃপ্তি অনুভব করে। লেখকের বর্ণনায় :

> ইন্দিরা বলিল, – যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।
> একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গেলাম। –
> ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। [...] আমি তৃপ্ত। (জগদীশ, ২০১৫ : ১২৬)

ইন্দিরার গভীরতম সান্নিধ্যের মধ্যদিয়ে রাণু ও কানু শরীরে, মনে ও আত্মায় আত্মস্থ করে মনের গভীরে তাদের প্রেমের আকর্ষণকে চিরন্তন করে রাখতে চায়। জগদীশ গুপ্তের গল্পত্রয়ে নিগূঢ় আখ্যানের জটিলতম প্রেম-ভালোবাসার ছবি মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

তিন. দ্বন্দ্বজটিল মনস্ক ও স্বার্থবাদী নারী

মানুষের স্বার্থপরতার চরমরূপ প্রকাশ পেয়েছে 'চার পয়সার এক আনা' গল্পে। শশীর ছেলে রসো ধুলো নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ যে একটি আনি কুড়িয়ে পায়, সেটাই হয়ে ওঠে শুধু পুরুষ নয় নারীদেরও লোভ ও ক্ষমতার প্রতীক। গরিব যৌথ পরিবারে কাশীর স্ত্রী কাঞ্চন, শশীর স্ত্রী মোক্ষদা,

ভগিনী কুমারীও বাদ যায় না' দাবিদার হয়ে ছুটে আসে পয়সাটি হস্তগত করতে। মুদ্রাটি তাদের উপার্জিত নয়, কুড়িয়ে পাওয়া – তাই এরা সবাই এটিকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে। কুমারী এটাকে হরির লুট দেয়ার পক্ষে, বড় বউ কাঞ্চন পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে বামনকে মুদ্রা প্রদানের পক্ষে, ছোট বউ মোক্ষদা মুড়ি-বাতাসা ক্রয় করে ছেলেদের ফূর্তির উদ্দেশ্যে ব্যয় করার পক্ষে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর এ স্বার্থবাদী রূপ তুলে ধরেন লেখক :

> সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল – কাশীর স্ত্রী. কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি-সবাই; কী করিয়া যে সেই দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিল তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য। সবারই ইচ্ছা ছিলো যে, আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয় – একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের, [...] প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিল, [...] হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিল [...] কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইল তাই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইল তাই, ভগিনী কুমারীর হইল তাই; (জগদীশ, ২০১৫ : ১৬৩)

সামান্য আনি পয়সা নিয়ে পরিবারের যে হট্টগোল সেখানে নারীরাও তাদের স্বার্থসর্বস্বতাকে নির্দেশ করে। স্বার্থপরতা মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম চারিত্র্যলক্ষণ। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানুষের স্বার্থপরতার স্বরূপ পরিবর্তন হলেও তা মনে এখনও ক্রিয়াশীল। মানুষের সভ্য রূপের আড়ালে নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর রূপ গোপন থাকে। নৈতিকতা ও কল্যাণকামিতা মানুষের উপরিতলে থাকলেও মানুষ প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত। মানবজীবনের তলদেশে যে বহুতর প্রবৃত্তি অবস্থান করে জগদীশ গুপ্ত 'বোনঝি গুঞ্জমালা' গল্পের মহেশ্বরী চরিত্রটির মধ্যদিয়ে তা অঙ্কন করেছেন। মহেশ্বরী তার মা-মরা বোনের মেয়ে গুঞ্জমালাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে প্রকাশ্যে নৈতিকতা ও কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করলেও অন্তরের তলদেশে সুপ্ত থাকে গুঞ্জমালাকে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণের স্বার্থপর চিন্তা। গুঞ্জমালা ও মহেশ্বরীর কথোপকথনে তা স্পষ্ট :

> মহেশ্বরী বলিল, 'যাই, বেলা গেছে। [...] যদি কেউ শুদোয়, মহেশ্বরী কোথায়? – ভদ্দর হোক, ইতর হোক, যদি শুদোয় বলবি, মাসি কাজে গেছে, সন্ধের পর আসবে। [...] তাতে সে যদি বলে, আমিও সন্ধের পর আসব, তখন তাকে তুই কী বলবি বল তো?
> – কী বলব জানিনে তো!
> – হাবা মেয়ে! বলবি, হুঁ। বলিয়া মহেশ্বরী ভারী কাতর প্রত্যাশী দৃষ্টিতে বোনঝি গুঞ্জমালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল [...] যেন সূচ্যগ্রের মতো ক্ষুদ্রতম ঐ হুঁ – শব্দটার উচ্চারণের উপর তার দুর্বহ জীবন অনন্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে – ঐ কথাটা তার 'জিওন কাঠি।' (জগদীশ, ২০১৫ : ১৭৫-১৭৬)

এছাড়া গুঞ্জমালার স্বর্ণালঙ্কার নিজের বলে বিবেচনা ও গ্রহণ করে মহেশ্বরী। যেখানে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতিও মহেশ্বরীর নেই দরদ, সহানুভূতি কিংবা মানবতা; আছে শুধু নিষ্ঠুরতা, শয়তানী ও স্বার্থপরতা। ড. সরোজমোহন মিত্র বলেন : "গল্পের পর গল্পে জগদীশচন্দ্র একের পর এক এই শয়তানীর স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন, এখানে কোথাও মানবিকতা নেই, দরদ বা সহানুভূতি নেই, আছে এক নিষ্ঠুর শয়তানী।" (সরোজমোহন, ১৯৯৭ : ২৩৪)

"কল্লোলীয় ছোটগল্পে সংশয়, অবিশ্বাস ও হতাশা যুদ্ধোত্তর জীবনে যে নতুন স্বরূপ উন্মোচন করে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে জগদীশ গুপ্তর সংশয়বাদী আধুনিক জীবনদৃষ্টি" (চঞ্চলকুমার, ২০০৯

: ২৭)। এই সংক্ষুব্ধ ও দ্বন্দ্বজটিল মনের পরিচয় পাওয়া যায় 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পের অভয়া চরিত্রে– যে মনের বিকাশে তার মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভয় জটিলতা পায়। অবচেতন মনের রহস্যময় অস্থিত আলোক অন্ধকার থেকে যে বোধের জন্ম ও বিস্তার, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয়া তারই আধারে সক্রিয়। মা অভয়া মেয়ে সপ্তদশী শান্তির রূপসৌন্দর্যের বিকাশে ভয়-ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন। আপন বিভ্রান্তিতে মাঝে মাঝে সে নিজের চাপা আতঙ্ক ও শিহরণে আত্মহননের পথ বেছে নিতে চায়। বাবা অতুলের সঙ্গে শান্তির পরকিয়া প্রেম, অশরীরী প্রেম, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন যৌনতা, চৌম্বন আকর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা যা অভয়ার কাছে উৎকট ও উদ্ভট বলে মনে হয়। যে ভয় ও সন্দেহ মনে জটিলতা আছে তা অভয়া-অতুলের দাম্পত্যের সূক্ষ্ম সন্দেহকে কেন্দ্র করে। অভয়ার সন্দেহ মনস্তাত্ত্বিক ও জটিলতা সৃষ্টির কারণ শান্তি অতুলের রক্ত সম্বন্ধের সন্তান নয় কাজেই অতুলের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক তার মনে ভাবনার জন্ম দেয়। সন্দেহ-র্জজরিত অভয়া স্বামীর স্বভাব উন্মোচন করে এভাবে :

> বল সত্যি ক'রে শান্তি ও তোকে নষ্ট করে নিতো? [...] নষ্ট করার মানে কী? আর 'ও' বলে তুমি কার কথা বলছ?
> 'ব্যাটাছেলে মেয়ে ছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিস নে?
> বুঝলাম। কিন্তু 'ও' মানে কী?
> 'অতুল'।
> [...] বাবার কথা বলছো?
> 'হ্যাঁ। ও ইচ্ছে করলে যে কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।'
> 'তুমি সত্যিই খেপে গেছো মা, [...]
> 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়, তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম'। (জগদীশ, ২০১৫ : ১৩৯)

বিকারগ্রস্থতা তীব্র হয় অভয়ার মনের গভীরে। সংকট, সংস্কার, সন্দেহ অভয়ার ব্যক্তিত্বকে যেমন জটিল করেছে, তেমনি ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব অনুশোচনাপূর্ণ পাপবোধে। এই আত্মস্খলন স্বভাব ও নিজস্ব পাপচিন্তা তাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। "তার মনে হইতে লাগিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে; [...] কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সংবিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়া ছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে [...] " (জগদীশ, ২০১৫ : ১৩৬)। এ গল্পে অভয়ার তীব্র অপরাধবোধ এবং শান্তির ভীতি যেমন অতুলের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব জাগায়, তেমনি নিজের মেয়ের আচরণে অনুশোচনা ও গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে। "মূলত জগদীশ গুপ্ত অভয়াকে ফ্রয়েডীয় যৌনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে চিরন্তন এক নারীর জটিল মনকে গল্পের কেন্দ্রে আদ্যন্ত সক্রিয় রেখেছেন" (বীরেন্দ্র, ১৯৮৫ : ২৭৩)। জগদীশ গুপ্তের গল্পে এভাবে উন্মোচিত হয়েছে সংশয় সমৃদ্ধ মন ও স্বার্থবাদী নারীরূপ।

চার. ভোগের সামগ্রীরূপে বিবেচিত ও সে কারণে সৃষ্ট প্রতিবাদী নারী

পুরুষ তার ইচ্ছাকে জিইয়ে রাখার জন্য নারীকে নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের বিধান ব্যবহার করে নিজেরা বিধিমালা তৈরি করে তাদের উপর আধিপত্য কায়েম করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন : "পুরুষ-শাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ" (পার্থ, ২০১০ : ২০)।

জগদীশ গুপ্তের 'আঠারো কলার একটি' গল্পে বেণুকর তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা করতে স্ত্রী জানকীর উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু জানকী নিজেকে নির্মাণ করেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা, যেখানে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বেণুকরের হস্তক্ষেপ হতে খানিকটা মুক্ত হতে পেরেছে। চার বছরের সংসার জীবনে বেণুকরের পারিবারিক জড়তা, শ্রান্তি ও একঘেয়েমিতা থেকে মুক্ত হতে যে ভ্রম সৃষ্টি হয়েছে সেই কঠিন অবস্থার যাঁতাকলে নিজেকে পিষ্ট না করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জানকী। জানকী স্বামীর বদ মতলব বুঝতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তারসহিত তার উত্তরও দেয় :

> বেণুকর আবার একটু হাসল। [...] তারপর বলল, 'শুনি, মেয়ে মানুষের আঠারো কলা – সত্যি নাকি?
> বক্তা কী বলতে চায় তা জানকী তৎক্ষণাৎ বুঝল, বলল, 'সত্যি নয়, কলা আঠারো তো নয়ই। তার ঢের বেশি – কেউ বলে ছত্রিশ, কেউ বলে চুয়ান্ন।' [...]
> বেণুকর বিস্মিত হ'লো, কয়েকবার হুঁকো টেনে বলল, 'এতো? কিন্তু তোর তো তার একটাও দেখিনে!'
> 'তা আশ্চর্য কী এমন! দেখাইনে তাই দেখো না।'
> জানকী বলল, 'চাষার ঘরে কলা! আচ্ছা দেখাব।' (জগদীশ, ২০১৫ : ২০৬-২০৭)

হাজার বছর ধরে চলে আসা পুরুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জানকীর প্রতিবাদ একটি বিদ্রোহী নারীসত্তার পরিচয় প্রদান করে। বস্তুগত জীবনে বেণুকর ও জানকীর কোনো অভাব বা সমস্যা ছিল না। আর বাধা বিপত্তিহীন অবিশ্রান্ত দাম্পত্য সম্ভোগ একঘেয়ে হয়ে যাওয়ায় বেণুকর জানকীর কাছে নতুনত্ব কিছু আশা করেছিল। বেণুকরের এ প্রবৃত্তি ও বিরক্তি থেকে মুক্ত করতে জানকী শিক্ষা দিয়েছিল। যা গল্পের শেষে জানকীর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "খানিক চুপ ক'রে থেকে জানকী একটু হাসল; তারপর বলল, 'আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না। এ তারই একটি। [...] রাগ করে না, [...] এসো খেতে দি'গে" (জগদীশ, ২০১৫ : ২১২)। 'বিধবারতিমঞ্জরী' গল্পে রতিমঞ্জরী স্পষ্ট অনুধাবন করে তার স্বামী অক্ষয় তাকে কখনও ভালোবাসেনি। দীর্ঘ এগার বছর দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে স্বামী জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও রতিমঞ্জরীর কাছে এ সময়টা যেন বেশ্যাবৃত্তিরই নামান্তর। রতি চেয়েছিল স্বামীর হৃদয়ভরা ভালোবাসা কিন্তু স্বামী অক্ষয় রতির দেহকে চেয়েছে। গল্পে আছে : "কেবল নারীরই রূপ আর দেহ, তার রূপ আর দেহে তিনি সম্ভোগ করে গেছেন – অন্তরে কামনা করেন নাই, পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই তার শরীরকে তিনি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিয়ে গেছেন" (জগদীশ, ২০১৫ : ৩০)। ভারতীয় পিতৃতন্ত্রের চর্চা ধর্ম আর সামাজিক অনুশাসনগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে যে, সেখানে নারীর স্থান নিতান্তই গৌণ। সেখানে নারীর স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মূল্যায়ন নেই। তাইতো এ গল্পে রতি ধর্মে ও সমাজে নারী আর পুরুষে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে অবস্থার প্রতি ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করে :

> পুরুষ বিপত্নীক হ'লে তাকে বিপত্নীক সেজে থাকতে হবে, এমন কোনো প্রথা নাই – নারী বিধবা হ'লে তার বিধবা সাজবার একটা তোড়জোড়ই দেখা যায়। [...] সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়, এই রমণীর সকল সুখের এবং ভোগের শোচনীয় বিয়োগান্তকভাবে অবসান হ'য়ে গেছে –' (জগদীশ, ২০১৫ : ৩১)

তাইতো স্বামীর মৃত্যুর পর রতি তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের কোন পুরুষকে পেতে পুনর্বিবাহের

বিজ্ঞাপন দেয়। তার সমাজের মানুষের প্রতি এমন চরম ক্ষোভ জন্মে যে সিদ্ধান্ত নেয় সে গণিকা হবে। নারী হিসেবে রতিমঞ্জরী বেশ সচেতন, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ও প্রতিবাদী। সে সমাজের ঘৃণ্য জাত-ভেদ প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

কামুক পুরুষের কাছে নারীর অবস্থা যে কত ভয়ংকর, অবমাননাকর তা জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পে প্রত্যক্ষ। দৈহিক ও দেহাতীত তৃষ্ণার ব্যগ্রতায় এবং পুরুষের দেহসর্বস্ব লোলুপতায় ও অর্থলোভে ক্ষণপ্রভার জীবনের চরম বিপর্যস্ত রূপ নিয়ে এ গল্পের পটভূমি রচিত। সে উপলব্ধি করে স্বামী দীনতাড়ণ তাকে কখনো ভালোবাসেনি শুধু ভোগের ক্ষেত্র অবারিত পেয়ে খেলা করেছে। যৌবনের শুরুতেই দীনতাড়ণের আচরণে এই যুবতী রমণীর মনে জন্ম নেয় হীনম্মণ্যতার এক গভীর সংকট : "ক্ষণপ্রভার বয়স যখন এই উনিশ, কিন্তু ক্ষণপ্রভা ভাবে যে উনিশ সেই কুড়ি, আর মেয়েমানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি" (জগদীশ, ১৯৫৩ : ৮৯)। কেননা ক্ষণপ্রভার স্বামীর তার প্রতি যৌবন সুধা ফুরালেই তাকে অবহেলা করে তার বোন প্রফুল্যকে বিয়ে করে। ক্ষণপ্রভার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে যখন ঝড় হাওয়া বইছে সে সময় তাকে দীনতাড়ণের শয্যাসঙ্গী হতে হলে তার মনে হয় দীনতাড়ণ কেবল একটা মাংসপিণ্ড – কদর্য ও লোলুপ। গল্পের শেষে : "এখন সে নগ্নদেহ সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই" (জগদীশ, ২০১৫ : ৯৯)। প্রেম ও মমত্বহীন দেহগত সম্পর্ক কোনো কোনো সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে – এ চরম সত্যই প্রতিপাদিত হয়েছে ক্ষণপ্রভার জীবনে। তার এই উন্মাদ অবস্থা যেন পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক মৌন প্রতিবাদ।

'আদি কথার একটি' গল্পে সুবলের লালসার কাছে কাঞ্চনের স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতা প্রাধান্য পেয়েছে। এ গল্পে কাঞ্চন যুবতী, জামাই সুবল পাঁচ বছরের পত্নী খুশি অপেক্ষা বয়সে বেশ বড় তাই শাশুড়ীকে বেশি পছন্দ করে জৈব তাগিদে। সুবলের বারবার সেই লোভার্ত দৃষ্টির কাছে কাঞ্চন সংকুচিত হয়। অস্বচ্ছল, সংসার জীবন, স্বামীহীন যৌনজীবন বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে মনের অজান্তে সে সুবলের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। কাঞ্চনের মনস্তত্ত্বে এক ধরনের স্ববিরোধী মানসিকতার প্রাবল্য চোখে পড়ে। একদিকে আপন পেটের মেয়ের প্রতি কর্তব্য, অন্যদিকে লালসাতুর বর্বর সুবলের কামনাক্লিন্ন হাতের আমন্ত্রণ। একদিকে অসহ্য আত্মগ্লানি, অন্যদিকে মেয়ের প্রতি কর্তব্যবোধ। "কিন্তু অপরিসীম অন্তর্দাহের সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিল, মেয়েকে এই চক্ষু দেখাইবার মত প্রবঞ্চনা আর পাপ জগতে আর কিছু নাই" (জগদীশ, ২০১৫ : ১০৭)। অন্যদিকে সমাজের মানুষ যখন তাকে দায়ী করে সুবলকে রেহাই দেয় তখন কাঞ্চনের বোধহীন দেহ নিশ্চুপ অপমানে মূর্চ্ছিত প্রায়। "কাঞ্চনের চুল ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া এমন খড়ম পেটা করিলেন যে, যে-ভূত মারের চোটেও পালায় না, সে তখন ঐ মার দেখিলেই পালাইত" (জগদীশ, ২০১৫ : ১১২)। এ নিষ্ঠুর ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী বলে কাঞ্চনের উপর সবকিছুর দায়ভার বর্তেছে। এই নিষ্ঠুর সমাজের অপমানে কাঞ্চন যেমন বোধহীন অনুরূপভাবে মৌনতাই তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপ।

জগদীশ গুপ্তের 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পে যে তিক্ত ও নির্মম জীবনদৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে সেখানে অসহায় পরাজিত নারী মাখনের নিষ্ঠুর নিয়তির জয় ঘোষিত হয়েছে। মাখন পুরুষশাসিত সমাজে শোষিত হয়েছে; সমাজে ও পরিবারে পায়নি সম্মান, অধিকার, স্বাধীনতা; সেই সাথে পায়নি নিরাপত্তাও। গল্পে মাখনের স্বামী সাত কড়ি মধুডাঙ্গার মেলায় একটি মেয়েকে ধর্ষণ করতে গিয়ে

পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দেড় বছর কারাভোগের পর বাড়িতে আসে। সাতু নিজ কর্মফলে লজ্জিত বা অপরাধবোধ না করলেও তার স্ত্রী মাখনের লজ্জা, ভয়ময় জীবনের ও নিরাশ্রয় ভাবের শেষ নেই। রাতে বাড়িতে এসে মাখনকে পেতে চাইলে মাখনের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় সাতু ভয় পেয়ে যায়। সাতু যদি সারাজীবন জেলে থাকত সেটাই মাখনের পক্ষে ভালো ছিল। সে শঙ্কার মধ্যে সাতুর জেল থেকে ফেরার দিন গুনতে থাকে। স্বামীর কৃতকর্মের অপরাধে মাখনবালার জীবন ও জগৎকে দেখার এতদিনের প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়। শাশুড়ি বিরাজের ছেলের প্রতি পক্ষপাত মাখনের ঘৃণাকে আরো তীব্র করে। রাতে শয়নকক্ষে শাশুড়ীর জোরাজুরিতে যেতে বাধ্য হলেও স্বামীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ক্রমশ সরে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার সমগ্র সত্তা সাতুকে রুখে দিতে উদ্যত হয় :

> বলিতে-বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থমকিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গিটি বড়ো অসাধারণ – তাহার উদ্দেশ্য যেন শুধু আত্মরক্ষা নয়, তাহার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতোই দুর্জয় হউক, আর এখানে-সেখানে সে যতোই ভুল করুক, এবার সে ভুল করিল না, আর ভয় পাইল, হটিয়া আসিয়া বলিল –
> 'মারবে নাকি?'
> মাখন বলিল; 'আমায় ছুঁয়ো না।'
> 'যদি ছুঁই?'
> 'ভালো হবে না।' (জগদীশ, ২০১৫ : ১২২)

ফলে গল্পের শেষে মাখনকে তার শাশুড়ি ঘাড় ধরে পথে বের করে দিলেও মাখন তার আচরণ ও কথায় তথা ব্যক্তিত্বে দৃঢ় ও অবিচল। তার এই দৃঢ়তা বিদ্রোহাত্মক মনোভাবেরই নামান্তর।

জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি ঘটনাকেন্দ্রিক নয়, চরিত্রকেন্দ্রিক। চরিত্রগুলি অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত নির্জ্ঞান মনের জটিলতার প্রতি। তবে চরিত্রসমূহের মধ্যে নারীচরিত্র চিত্রণে সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা অধিক পরিমাণে উপস্থিত। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে সমরেশ মজুমদার বলেন : "জীবনকে খুব উলঙ্গ করে দেখাতে গিয়ে নারীর অভ্যন্তরে অথবা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। নারী সম্পর্কে যে সম্ভ্রমবোধ এবং আব্রু রচনা করে তাদের অন্য একটি জগতের অধিবাসী করে তোলার যে প্রচেষ্টা এতোকাল বিদ্যমান ছিল তা ভেঙ্গেছেন জগদীশ গুপ্ত" (সমরেশ, ২০১২ : ২০৪)।

নারী-চরিত্রের মনোলোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েনে জগদীশ গুপ্তের গল্প বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। পরিচিত মানুষ, সমাজ থেকে সর্বোপরি আপন আত্মীয়দের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পের অভয়া, 'বিধবা রতিমঞ্জরী' গল্পের রতি, 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পের ক্ষণপ্রভা, 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পের মাখন, আদি কথার একটি গল্পের কাঞ্চন। সমাজ ও মানুষ বিচ্ছিন্নতা তাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে এবং ধীরে ধীরে বিকারগ্রস্ত হতে থাকে সে। রতির মধ্যে আত্মিক বিচ্ছিন্নতার চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের মানুষের প্রতি চরম ক্ষোভে সিদ্ধান্ত নেয় সে গণিকা হবে। নারীর মানবীয় অন্তর্জগৎ এবং সামাজিক বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠে ক্ষণপ্রভা চরিত্রে; গল্পের শেষে যার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। নীতিবোধের প্রাবল্যে মূর্ছিত মাখন

মনোদৈহিক বাস্তবতায় পরাস্ত। স্ববিরোধী মানসিকতার প্রবল চাপ প্রত্যক্ষজাত কাঞ্চন চরিত্রে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে ব্যভিচারী, নীতিবর্জিত ও দেহ সর্বস্ব পুরুষ চরিত্রের বিপরীতে নারী মানসিকভাবে হয়েছে বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত ও বিকারগ্রস্ত।

উপসংহার

জগদীশ গুপ্ত মনোলোক-সচেতন লেখক। তাঁর গল্পে মানব-সম্পর্কের নানামুখী জটিল আবর্তন যেমন উল্লেখযোগ্য অনুরূপভাবে বিবর্তনও লক্ষযোগ্য। 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পে স্বামীর দেহ সর্বস্বতায় স্ত্রী ক্ষণপ্রভার দুঃসহ ও অস্বাভাবিক জীবন; 'আদি কথার একটি' গল্পে কাঞ্চন তারই মেয়ের স্বামীর বিকৃত কামের দ্বারা মর্মান্তিক অন্ধকারে হয় নিক্ষিপ্ত। নীতিবিবর্জিত মহেশ্বরী, সূর্যমুখীর মধ্য দিয়ে অশুভ ইচ্ছার অস্তিত্বের পাশাপাশি রয়েছে শুভ চেতনাসম্পন্ন নারীর উপস্থিতি। নারানী, কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী এরা চিরায়ত বাঙালি নারী তথা মাতৃত্বের প্রতিভূ। জগদীশ গুপ্ত প্রথাগত নৈতিক আদর্শের নিরিখে নারীকে বিশ্লেষণ না করে বাস্তবতায় বিচার করেছেন। তাই তাঁর গল্পে বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে মানব মনের বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *কালের পুত্তলিকা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার (১৩৯৫)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*। অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (২০১০)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

চঞ্চলকুমার বোস (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১০)। *নিম্নবর্ণের ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৬)। *নৈঃসঙ্গ্যচেতনা*। এডোর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৮৫)। *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (প্রথম খণ্ড)। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রশীদ করীম (১৩৯৫)। *'শওকত ওসমানের জননী'*। সংবাদ, ঢাকা।

সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পা., ২০১৫)। *জগদীশ গুপ্তের গল্প*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সমরেশ মজুমদার (সম্পা., ২০১২)। *জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭১)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

সরোজমোহন মিত্র (১৯৯৭)। *বাংলার গল্প ও ছোটগল্প*। তুলশী প্রকাশনী, কলকাতা।